গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আন্দোলনের চাপে প্রথম শ্রেণি থেকেই খুলল স্কুল ঃ জনগণকে অভিনন্দন

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল পুরোপুরি খোলার সরকারি ঘোষণাকে আন্দোলনের জয় বলে অভিনন্দিত করলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি, এআইডিএসও, এআইএমএসএস এবং বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটি। সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া দরকার ছিল। তা হলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি কিছুটা এড়ানো যেত। তাঁরা একে দেরিতে হলেও সরকারের বোধোদয় বলে অভিহিত করেন। আন্দোলনের পাশে থাকা অভিভাবক-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। ইতিমধ্যে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হয়ে গিয়েছে তাদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তাঁরা। কোভিড পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষার সব স্তরে সব রকমের ফি মকুবের দাবিও তাঁরা জানান।

কলেজ স্ট্রিট, ১৪ ফেব্রুয়ারি

দেশে আত্মঘাতী দৈনিক গড়ে ২৩ জন

শেষে মৃত্যুর ফেরিওয়ালা হলেন মোদিজি!

"প্রধানমন্ত্রী, আমার আত্মহত্যার জন্য আপনিই দায়ী"—ফেসবুক লাইভে এসে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার আগে দেশের মানুষের উদ্দেশে এ কথা বলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের রাজীব তোমর। জুতোর ছোট ব্যবসা ছিল তাঁর। বিজেপি সরকারের নির্লজ্জ একচেটিয়া পুঁজিপতি তোষণকারী নীতির পরিণামে যে অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী, ছোট কারখানার মালিক, সাধারণ চাকরিজীবী কিংবা শ্রমিক-দিনমজুর দিনে দিনে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে চলেছেন, তোমর ছিলেন তাঁদের একজন। শুধু তিনিই নন, গত কয়েক বছরে দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের ময়দান ছাড়াও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রের আরও বহু মানুষ আত্মঘাতী হওয়ার জন্য সরাসরি দায়ী করে গেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। বিজেপি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী যে জঘন্য পদক্ষেপগুলি এঁদের প্রাণ কেড়ে নিল, সরকারের প্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব তো প্রধানমন্ত্রীর ওপরেই বর্তায়!

দেশে প্রতিদিন আত্মঘাতী হন গড়ে ২৩ জন। তোমর যেদিন আত্মঘাতী হন, সেই ৯ ফেব্রুয়ারিই রাজ্যসভায় খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এ কথা জানিয়েছে। তথ্য দিয়ে তারা জানিয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২০— এই তিন বছরে দেশের ২৫ হাজার ২৩১ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। এঁদের কেউ

পাঁচের পাতায় দেখুন

জনগণের নয়, নজর কর্পোরেটের স্বাস্থ্যে

স্বাস্থ্য বাজেট

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট জনমুখী, না কর্পোরেটপন্থী? বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার দ্বারা কি জনগণের চিকিৎসার খরচ মিটবে, না কি চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য?

করোনার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঢেউয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাবে যেভাবে হাজারে হাজারে মানুষ কার্যত বিনা চিকিৎসায়, বিনা অক্সিজেনে মারা গেল, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে যে ধরনের জনমুখী স্বাস্থ্য বাজেট প্রয়োজন ছিল, এবারের স্বাস্থ্য বাজেটে তার ছিটেফোঁটা প্রতিফলনও দেখা গেল না। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বুনিয়াদি জায়গা থেকে বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই করে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। তা হলে চিকিৎসা হবে কী দিয়ে? এই স্বাস্থ্য বাজেটে কার্পণ্য কি সরকারের অর্থের অভাবের জন্য? তা হলে প্রতিরক্ষা খাতে ৫.২৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হল কী ভাবে যা মূল বাজেটের ১৩.৪ শতাংশ? স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২.২৬ শতাংশ যা গতবারের বরাদ্দ ৩.৩৭ শতাংশের থেকেও অনেক কম। ২০১৭-র তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি যেখানে বলছে ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ২.৫ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে, সেখানে এবছর সর্বসাকুল্যে দাঁড়িয়েছে জিডিপির মাত্র ০.৩৪ শতাংশ। এর দ্বারা কি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্ভব?

অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য বাজেট পেশ করে সগর্বে ঘোষণা করলেন, গত বছরের তুলনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হল। ঘোষণা শুনে মনে হতে পারে, এ তো অনেক বৃদ্ধি! কিন্তু সত্যিই কি এতটা বেড়েছে? না কি হিসাবে জল মেশানো আছে! সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী গত বছর স্বাস্থ্য বাজেট ছিল ৭৩ হাজার ৯৩১ কোটি টাকা, সেখানে এ বছরে সমগ্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হল ৮৬২০০.৬৫ কোটি টাকা। যা অঙ্কের হিসাবে গত বারের প্রাথমিক বরাদ্দের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। কিন্তু এখানে যে গোঁজামিল রয়েছে তা সরকার গোপন করে গেল। গত বছর জনমতের চাপে স্বাস্থ্য বাজেট সংশোধিত করে ধার্য করা হয়েছিল ৮৬০০০.৬৫ কোটি টাকা। এবার তার থেকে মাত্র ২০০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। শতাংশে বৃদ্ধি মাত্র ০.২৩ শতাংশ। যার মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি, পুষ্টি, স্যানিটেশন, আয়ুষ্মান ভারত, স্বাস্থ্যের ডিজিটালাইজেশন এবং নানা কেন্দ্রীয়

সাতের পাতায় দেখুন

'দুয়ারে মদ' বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে মদ' প্রকল্পের বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এবং পথ অবরোধ করে। পুলিশ ৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে।

হিজাব বিতর্ককে শাসক শ্রেণি হীন উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে

কর্ণাটকের একটি কলেজে হিজাব পরে আসা ছয়জন ছাত্রীকে ক্লাস করতে না দেওয়ায় গত মাসে যে বিতর্কের সূত্রপাত, বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারের উস্কানিমূলক ভূমিকায় তা সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছে। হিজাবের বিরুদ্ধে গলায় গেরুয়া স্কার্ফ পরে কেউ কেউ যেমন এই বিতর্কে ইন্ধন দিচ্ছে, তেমনি তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিজাব পরা সাংবিধানিক অধিকার প্ল্যাকার্ড নিয়ে আর একদল রাস্তায় নেমেছে। এসইউসিআই (সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কে উমা ১১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে বিষয়টি কলেজেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারত সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকায় তা বিতর্ক হিসাবে রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, সেকুলার ভারতের স্বপ্নকে উড়িয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষালয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির চর্চা করে

পাঁচের পাতায় দেখুন

মিড ডে মিলে বরাদ্দ ছাঁটাই অপুষ্টির শিকার শিশুরা

স্কুলের শিশুদের খাদ্য হিসাবে বরাদ্দ মিড ডে মিল। তা নিয়েও চলছে সরকারের চরম অবহেলা। স্কুলছুট রুখতে এবং শিশুদের পুষ্টি ঠিক রাখবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০০৪ থেকে স্কুলে মিড ডে মিল চালু হয়েছিল। তাতে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশু অর্থাৎ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের শিশুদের খাবার পাওয়ার কথা। প্রাথমিকের ১১ বছর বয়সী শিশুদের ৪৫০ ক্যালরি এবং উচ্চ প্রাথমিকের শিশু-কিশোরদের ৭০০ ক্যালরি পুষ্টিমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই পুষ্টিমাত্রা অধরাই থেকে গেছে। করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও যা শুধু আশ্চর্যের নয়, লজ্জারও বিষয়।

পুষ্টিকর খাদ্য শিশুদের করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অথচ সরকারি বরাদ্দে তার কোনও বালাই নেই। কেবল চাল আর আলু। এখন তার সঙ্গে মাত্র ২৫০ গ্রাম করে মুসুর ডাল ও চিনি দেওয়া হচ্ছে। মাঝে ১০ মাস ১ কেজি করে ছোলা পেয়েছিল শিশুরা। ছোলার বেশিরভাগ অংশই এত নিম্নমানের ছিল যে তা গরুকে খাওয়াতেও সাহস করেননি অভিভাবকেরা। বিধানসভা নির্বাচনের ৩ মাস সময় অবশ্য সয়াবিন যুক্ত হয়েছিল। মে মাসে ২০০ গ্রাম, পরের ২ মাস কমে ১০০ গ্রাম হয়েছিল। বর্তমানে তাও উধাও। আবার ওই সময় ডাল ও চিনি ৫০০ গ্রাম করে দেওয়া হত। বর্তমানে তা কমিয়ে ২৫০ গ্রাম করে দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে যখন মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার পরিবেশিত হত তখন শিশুরা সপ্তাহে অন্তত ১টি ডিম (কলকাতায় ২টি করে) পেত। কিন্তু করোনা অতিমারির জন্য রান্না বন্ধ। তাই মাসে একবার করে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা চলছে। কিন্তু প্রায় ২ বছরের করোনাকালে শিশুরা ১টিও ডিম পেল না।

সরকারি নিয়ম, যে ক'দিন স্কুল চলবে সে ক'দিনের জন্য শিশুরা মিড ডে মিল পাবে। অর্থাৎ মাসে গড়ে ২০ দিনের। অথচ এখন শিশুরা বাড়িতে থাকলেও ৩০ দিনের জন্য খাবার দেওয়া হল না। তার ওপর চলেছে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিয়েও বঞ্চনা। মিড ডে মিল রান্নার সময় উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম করে চাল বরাদ্দ করা হত। মাসে ২০ দিনের জন্য ৩ কেজি করে বরাদ্দ করা হত। কিন্তু এখন পাচ্ছে ২ কেজি করে। অর্থাৎ মাসে ১ কেজি করে কম চাল দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের অভিযোগ, কেন্দ্র কম পরিমাণ চাল দিচ্ছে। শিশুদের খাদ্য নিয়েও চলছে কেন্দ্র-রাজ্য দড়ি টানাটানি। শিশুরা থাকছে বঞ্চিতই।

মিড ডে মিলে মাথাপিছু বরাদ্দও কম। প্রাথমিকে মাত্র ৪.৯৭ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭.৪৫ টাকা। যখন রান্না চলত তখন এই সামান্য টাকায় চাল ও রাঁধুনির খরচ বাদে জ্বালানি, সবজি, তেল-মশলা, ডাল, ডিম ইত্যাদি কেনা হত। কিন্তু এখন তো রান্না হয় না। ফলে সমস্তটাই ছাত্রদের খাদ্যসামগ্রীর জন্য ব্যয় করা উচিত। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘ ২ বছরের করোনাকালে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটা ব্যয় করাই হয়নি। জানুয়ারি মাসের হিসেব দিলেই তা পরিষ্কার হবে। মাসে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রাথমিকে ৪.৯৭×২০= ৯৯.৪০ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭.৪৫×২০ =১৪৯ টাকা। খাদ্যসামগ্রীর জন্য ব্যয় ২ কেজি আলুর জন্য ৪০ টাকা, ২৫০ গ্রাম করে মুসুর ডাল ও চিনির জন্য যথাক্রমে যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ১১ টাকা। অর্থাৎ মোট ৪০+২৫+১১=৭৬ টাকা। অর্থাৎ যতটুকু বরাদ্দ তা-ও ব্যয় করা হল না, বঞ্চনা করা হল প্রাথমিকে ২৩.৪০ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭৩ টাকা করে। এই টাকা কোথায় গেল? রাজ্যের এই স্তরের সব ছাত্রদের হিসাবে ধরলে এই বঞ্চনার পরিমাণ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে মূলত আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরা আসে। করোনা পরিস্থিতিতে তাদের বহু পরিবারের কাজ নেই। বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান একেবারে তলানিতে। সমীক্ষায় প্রকাশিত, দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষ না খেয়েই রাতে ঘুমোতে যান। অন্য এক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে ১টি অপুষ্টিতে ভুগছে। এর ওপর রয়েছে করোনার তৃতীয় ঢেউ যেখানে শিশুরা বেশি করে আক্রান্ত হবে বলে বিজ্ঞানীদের মত। সেই সমস্ত শিশুকে যদি পরিকল্পিতভাবে অপুষ্টিতে রাখা হয় তবে তারা সংক্রমণ প্রতিহত করবে কী ভাবে? মিড ডে মিল চালু করবার অন্যতম কারণ ছিল স্কুলছুট কমানো। বর্তমানে স্কুলছুট কমা তো দূরের কথা বাড়ছে ব্যাপক হারে। অভাবের তাড়নায় স্কুলছাত্র শিশু কিশোররা নানা কাজে লেগে অর্থ রোজগারের চেষ্টা করছে। নাবালিকাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও তারা নিজেরাই বিয়ে করে নিচ্ছে। ব্যাপক স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন ছাত্রের দু'বেলার হিসেবে পুষ্টিকর খাদ্যের পুরোপুরি দায়িত্ব সরকারিভাবে নেওয়া। নচেৎ সমস্ত আয়োজনই বিফলে যাবে। ছাত্রাভাবে স্কুল তুলে দেওয়ার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

মিড ডে মিলের মতো মিড ডে মিল ওয়ার্কারদের জীবনেও দুর্দশার অন্ত নেই। মূলত দরিদ্র পরিবারের মায়েরা এ কাজে আসেন। তাদের ভাতা হিসাবে মাথাপিছু মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা দেওয়া হয়। তাও ২৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন হলেও ১০০ জনে মাত্র ২ জন রাঁধুনি। এরপর প্রতি ১০০ জন ছাত্র পিছু ১ জন করে রাঁধুনি রয়েছে। যা দিয়ে এতজনের রান্না কোনও মতেই সম্ভব নয়। তাও তাঁদের সারা বছর ভাতা দেওয়া হয় না। পুজো এবং গরমের ছুটিতে রান্না বন্ধ, তাই ভাতাও বন্ধ। সংসারের কাজ ফেলে এঁরা সকালবেলায় বিদ্যালয়ে আসেন। তারপর নানা আয়োজনের পর রান্না করে শিশুদের যত্ন করে খাওয়ান। সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে প্রায় বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরেন। এটাই তাঁদের রোজনামচা। এত খাটুনির পরও তাদের নিজেদের উদরপূর্তির। বঞ্চনার শিকার শিশু থেকে রাঁধুনি সকলেই।

ওষুধ কমানোর প্রতিবাদে হাসপাতালগুলিতে বিক্ষোভ চিকিৎসক ও নাগরিকদের

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ২৮৩টি ওষুধ বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে লিফলেট বিলি, প্রচার ও কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি চলছে। সর্বত্রই চিকিৎসক এবং রোগীর পরিজনেরা সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছেন এবং সংগঠনগুলির উদ্যোগে পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হওয়ার অঙ্গীকার জানাচ্ছেন।

আর জি কর হাসপাতালে প্রচার আন্দোলন। ১২ ফেব্রুয়ারি।

জীবনাবসান

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর লোকাল সাংগঠনিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক প্রবীণ কমরেড হরমুজ খাঁ কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি দুর্লভপুরে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং বহু গুণমুগ্ধ মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হন। দলের পক্ষ থেকে জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও তাঁর সহযোদ্ধা কমরেড স্বাধীন দলুই সহ নেতা-কর্মীরা বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত হন। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড স্বাধীন দলুই। ১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল চিনপাই, পারুলিয়া, সাহাপুর প্রভৃতি পঞ্চায়েতগুলিতে। কমরেড খাঁ এই সময় নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদি মনের জন্য আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রয়াত জননেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জি ও জননেতা কমরেড ব্রজগোপাল সাহার সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। ক্রমশ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় নিজেকে গড়ে তোলায় ব্রতী হন। এলাকায় বেনাম ও সিলিং উর্দ্ধ জমি উদ্ধার করে গরিব মানুষের মধ্যে বিলির কাজে সংগঠকের ভূমিকা নেন। মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনও তিনি গড়ে তোলেন। পারিবারিক পিছুটান মুক্ত হয়েই দুবরাজপুর সহ ব্লকের সমস্ত জায়গা ও খয়রাশোল ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তাঁর কষ্টসাধ্য ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা ছিল। তিনি একজন সম্পন্ন ধনী চাষী পরিবারের সন্তান হয়েও নিজের সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির দিকে নজর দেননি। তার ফলে আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও কোনও দুঃখ বা আক্ষেপ তাঁর ছিল না। বরং গরিব মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যে ছিল। এজন্য তাঁকে চরম লাঞ্ছনা ও জোতদারদের সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। দু'বার প্রাণনাশের অপচেষ্টার হাত থেকে কোনও ক্রমে বেঁচে যান। বারে বারে তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কয়েক বার কারাবাস করতে হয়েছিল। বহুবার সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন কমরেড খাঁ। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি গভীর আবেগ থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ শিক্ষিত মহলেও তাঁকে বিশেষ স্থান দিয়েছিল। অসুস্থ থাকার কারণে তিনি কয়েক বছর সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন না। কিন্তু সমস্ত কর্মসূচির খবর নিতেন নিয়মিত। নিয়মিত সদস্য চাঁদা জমা দিতেন। কমরেডরা বাড়িতে এলে অত্যন্ত আবেগময় হয়ে উঠতেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁকে কেন্দ্র করে দলের প্রতি গভীর ভালবাসা গড়ে উঠেছে। ছোটদের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ছিল। নিষ্ঠা, সততা, বামপন্থী ও বিপ্লবী আন্দোলনের ঝান্ডা বাহক হিসেবে তিনি পরিচিত মহলে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে এলাকার গরিব মানুষ হারাল তাঁদের একান্ত আপন জনকে।

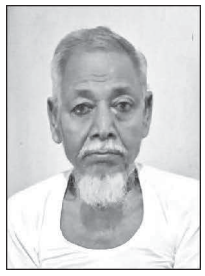

কমরেড হরমুজ খাঁ লাল সেলাম

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের আত্মবলিদান মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক আলোকবর্তিকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের আত্মবলিদান দিবস ২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৩১ সালের ওই দিনে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্কে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি 'আজাদ'-ই রয়ে গেছেন।

১৯২১ সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দ্বারা জেলখানাগুলি ভরে গেছে। বেনারস থেকে অন্যদের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৫ বছরের বেশ মজবুত শরীরের এক ছেলেকে। আদালতে তাঁকে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার নাম কী?' ছেলেটি নির্ভয়ে জবাব দেন—'আজাদ'। 'বাবার নাম কী?' তিনি সাহসের সাথে উত্তর দেন—'স্বাধীনতা'। বিরক্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আবারও জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার বাড়ি কোথায়?' এবারও দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব এল—'জেলখানা'।

রেগে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে শাস্তি হিসেবে ১৫টি বেত্রাঘাত এবং ১৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বেতের আঘাতে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠছিল, শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল, কিন্তু প্রতিবারই তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। পরের দিন 'প্রভা' পত্রিকার প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হয় 'বীর বালক আজাদ' শিরোনামে এক সংবাদ। সেই খবর সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে তিনি 'আজাদ' নামে পরিচিত হন। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই ছেলেটির নাম চন্দ্রশেখর আজাদ। মানবজাতির প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ও দরদি মন, সামাজিক দায়িত্ববোধ, অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি, সাহসিকতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, জীবন শৃঙ্খলা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি ১৯২০-র দশক জুড়ে উত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯১২-র পর থেকে ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর ভারতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন বিস্তারের জন্য রাসবিহারী বসু, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন সান্যাল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস সহ অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর গোষ্ঠীর বেশ কিছু বিপ্লবী উত্তর ভারতে যান। তাঁরা উত্তরভারতের বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হয়ে নতুন রূপে, নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এরই পাশাপাশি মূলত ১৯১৫ সালের পর থেকেই গান্ধীজি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনা করা শুরু করেন।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। তখন চন্দ্রশেখর আজাদের বয়স ১৩ বছর। তিনি তখন বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র। এই ঘটনা তাঁর মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে নির্দ্বিধায় আজাদ সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন এবং কারাবরণ করেন। এই আন্দোলন যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছিল, তখন হঠাৎ চৌরিচৌরায় জনতার উপর পুলিশের গুলি চালানোয় ক্ষিপ্ত জনতার হাতে কয়েকজন কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে আন্দোলনকারী জনতা, বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও চরম হতাশা এবং কংগ্রেসের কার্যনীতির প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাব দেখা দেয়। আজাদের মনেও গান্ধীজির আপসপন্থী কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা দেখা দেয়।

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের ৯২তম আত্মবলিদান দিবস স্মরণে

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে গড়ে উঠেছে বিপ্লবী সংগঠন 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি' (এইচআরএ)। বেনারসে এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন প্রণবেশ চ্যাটার্জি এবং মন্মথনাথ গুপ্ত। চন্দ্রশেখর আজাদ প্রণবেশ চ্যাটার্জির সংস্পর্শে আসেন।

উত্তর ভারতে এইচআরএ-এর কর্মকাণ্ড দ্রুততার সাথে বাড়তে থাকে। বিপ্লবীরা সরকারি কোষাগার লুঠ করে তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের কাকোরি ও আলমনগর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় লক্ষ্ণৌগামী ট্রেন থামিয়ে সরকারি কোষাগারের টাকা লুঠ করা হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি 'কাকোরি ট্রেন ডাকাতি' নামে পরিচিত। ১৯২৬ সালে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং ঠাকুর রোশন সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড, পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। ব্রিটিশ পুলিশ শুধুমাত্র ধরতে পারেনি এই মামলার অন্যতম প্রধান আসামী চন্দ্রশেখর আজাদকে। তিনি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

কাকোরি ঘটনার পরে পুলিশ এবং প্রশাসনের তৎপরতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিপ্লবীরা একের পর এক গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার ফলে সংগঠনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু হার না মানা অদম্য মনোবল এবং অপরাজেয় ইচ্ছা শক্তি নিয়ে আজাদ সংগঠনের পুনর্গঠনের দায়িত্ব একা নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং গ্রেপ্তারি এড়াতে সংগঠনের কর্মকাণ্ড শাহজাহানপুর থেকে সরিয়ে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে স্থানান্তরিত করেন। এখানে সদাশিব রাও মলকাপুরকর, বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন, ভগবানদাস মাহোর প্রমুখদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। এইভাবে উত্তর ভারতে সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিস্তারের প্রক্রিয়াতেই ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু সহ পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়।

ভগৎ সিংয়ের সংস্পর্শে আসার পর আজাদের চিন্তাজগতেও আমূল পরিবর্তন সাধন হয়। প্রথম জীবনে আজাদের চিন্তাধারা আর্য সমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের অপসারণ। কিন্তু ভগৎ সিংয়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি অর্জনই শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে না। শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রই মানুষের প্রকৃত মুক্তি আনতে পারে এবং ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং সহ দলের অন্যান্য বিপ্লবীরা ১৯২৮ সালে দিল্লির ফিরোজশাহ কোটলাতে একত্রিত হয়ে সভা করে সমাজতন্ত্রকেই নিজেদের দলের উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দলের নামের সঙ্গে 'সোস্যালিস্ট' শব্দ জুড়ে 'এইচআরএ' থেকে পরিবর্তন করে 'এইচএসআরএ' (হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন) রাখেন। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে চন্দ্রশেখর আজাদ দলের প্রথম সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যৌথ কর্মপ্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। দলের সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে ব্যক্তিহত্যা ও গুপ্ত কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর জনতাকে সংগঠিত করে গণ আন্দোলন গড়ে তুলে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও প্রতিবাদী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 'পাবলিক সেফটি বিল' ও 'ট্রেড ডিসপিউট বিল' নামে দুটি কালা বিল পেশ করে। দেশজুড়ে সর্বত্রই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। 'এইচএসআরএ'-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৯ সালের ৯ এপ্রিল অ্যাসেম্বলি চলাকালীন সেখানে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করে বিলের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন। এই পুরো পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে। এই ঘটনা ব্রিটিশের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এরপর ব্রিটিশ পুলিশ একে একে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে এবং ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে মামলা শুরু করে, যা 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে এই তিন বিপ্লবী হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িতে জীবনাহুতি দেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন চন্দ্রশেখর আজাদ আত্মগোপন করে ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এসব সত্ত্বেও নিজের জীবন বিপন্ন করে সংগঠনকে পুনর্গঠন এবং ভগৎ সিং সহ বিপ্লবীদের জেল থেকে মুক্ত করার নানাপ্রকার পরিকল্পনা তিনি করছিলেন। এই উদ্দেশ্য থেকে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর সঙ্গে তিনি সীতাপুর জেলে দেখা করেন এবং তাঁর পরামর্শ মতো ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এলাহাবাদে দেখা করতে যান। উদ্দেশ্য ছিল নেহরুর মারফৎ গান্ধীজিকে রাজি করিয়ে আসন্ন গান্ধী-আরউইন মিটিংয়ে বিপ্লবীদের মুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা। কিন্তু আপসপন্থী নেহরু আজাদের এই প্রস্তাবে রাজি হননি এবং তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। এতে একবুক ভরা নিরাশা নিয়ে আজাদ এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে (বর্তমানে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক) এইচএসআরএ-এর একজন সদস্য সুখদেব রাজের সাথে দেখা করতে আসেন। কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক গোপনে পুলিশকে খবর দিলে আলফ্রেড পার্কে আজাদকে পুলিশ ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আজাদ আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এবং একা পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। একদিকে একটি মাত্র পিস্তল নিয়ে অসীম সাহসী বিপ্লবী আজাদ, অপরদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ পুলিশ। আজাদ অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। পিস্তলে একটি মাত্র গুলি বেঁচে থাকতে নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মাহুতি দেন এবং শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

আজাদ কেবলমাত্র দলের সেনাপতিই ছিলেন না, এই দল নামক বিপ্লবী পরিবারের অগ্রজও ছিলেন। তিনি সকলের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরও রাখতেন।

সাতের পাতায় দেখুন

জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে তমলুকে বিক্ষোভ

২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে মানিকতলা মোড়ে জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাজেটে নেই নতুন কর্মসংস্থানের দিশা, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী কোনও কাজের দিশাও বাজেটে নেই। শিক্ষা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মধ্য দিয়ে 'প্রধানমন্ত্রী ই-শিক্ষা'-র পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের নীলনক্সা আনা হয়েছে। মানিকতলা মোড়ে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণব মাইতি, তমলুক লোকাল কমিটির সম্পাদক জ্ঞানানন্দ রায়, জেলা কমিটির সদস্য শীলা দাস, তপন জানা প্রমুখ।

শিক্ষক পদপ্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে এ আই ডি ওয়াই ও

মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নিয়ম মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগ করছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের দুর্নীতি ও বঞ্চনার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন শিক্ষক পদপ্রার্থীরা। ২০১৯ সালে প্রায় এক মাস ধরনা ও অনশন চালানোর পর সরকারি প্রতিশ্রুতিতে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। কাজ না হওয়ায় ২০২১ সালে আবার তাঁরা অনশন শুরু করেন। সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী ও কমিশনের চেয়ারম্যান দ্রুত নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আজও চাকরি হয়নি আন্দোলনকারীদের। প্রতিবাদে ধর্মতলায় গত ৮ অক্টোবর থেকে আবার তাঁরা ধরনা ও অনশনে বসেন। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, মেধা তালিকার সকল পদপ্রার্থীকে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মাধ্যমে কমিশন যে সব বেআইনি নিয়োগ করেছে, সেগুলি বাতিল করতে হবে এবং এই দুর্নীতিতে কমিশনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ডোমজুড় বইমেলায় পার্টির বুকস্টল

বেশ কয়েক বছরের মতো এবারও হাওড়া জেলায় ডোমজুড় বইমেলায় ২৯ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পার্টির পক্ষ থেকে সুসজ্জিত বুকস্টল হয়। এবার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ যেভাবে স্টলে এসে বই কিনেছেন ও মতামত ব্যক্ত করেছেন তা খুবই লক্ষণীয়। একজন যুবক এসে চারটি বই নিয়ে বললেন, আগের বার 'ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা উচিত কি না' বইটি কিনে পড়েছিলাম। ভাল লেগেছে, তাই এবারও এলাম। এক মহিলা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ প্রসঙ্গে' বইটি সংগ্রহ করে বললেন, আমাদের পার্টির (সিপিএম) তো এই ধরনের বই নেই। বুকস্টলের অভিজ্ঞতা বলছে, দলের প্রতি সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য দলের কর্মী-সমর্থকদের আগ্রহ ও আকর্ষণ ক্রমাগত বাড়ছে। অনেকেই যোগাযোগ করার জন্য ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

দুয়ারে মদ ঃ তমলুকে মিছিল পরিচারিকাদের

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি তমলুক শাখার পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি মানিকতলায় রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তর থেকে মদের জন্য 'ই-রিটেল পোর্টাল' চালু করার বিরুদ্ধে মিছিল হয়। পরিচারিকারা বলেন, রাজস্ব আদায়ের নামে এ ভাবে মদ বিক্রি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছে তাঁরাও তাতে সামিল। তাঁরা বলেন, দুয়ারে মদ প্রকল্প হলে ঘরে ঘরে অশান্তি বাড়বে, নারী নির্যাতন বাড়বে, সংস্কৃতির আরও অবক্ষয় ঘটবে। মদ প্রকল্প বন্ধ করে মানুষকে শিক্ষা, কাজ দেওয়াহোক।

চরক শপথ চালুর কোনও যুক্তি নেই

চিকিৎসক হিসাবে রোগীদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা, চিকিৎসার নামে কারও ক্ষতি না করা, মানুষকে সেবা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকার যে শপথ চিকিৎসকদের নিতে হয় সেটি 'হিপোক্রেটিক ওথ' নামে পরিচিত। এই শপথে পরিষ্কার বলা আছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত, ধনী-গরিব, দেশি-বিদেশি ইত্যাদি বিভেদ করা চলবে না। বিশ্বের সর্বত্র চিকিৎসকরা এই শপথ নেন। সেটিকে মোদি সরকার পাল্টে দিতে চলেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেডিকেল পাঠক্রম থেকে হিপোক্রেটিক ওথ বাতিল করে তার পরিবর্তে চালু করা হবে মহর্ষি চরক শপথ।

প্রাচীন গ্রিসের প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক হিপোক্রেটিস চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক নামে পরিচিত। অন্য দিকে মহর্ষি চরক প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম রূপকার। দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারি ছাত্ররা হিপোক্রেটিক ওথ পাঠ করে রোগীর কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রতিজ্ঞা করছেন। হঠাৎ তা পরিবর্তনের কী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল? সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের গভীর চক্রান্ত। এর মধ্য দিয়ে সরকার আসলে মেডিকেল শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কারগুলিকে বিজ্ঞানের নামে চালাতে চাইছে।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের যুক্তি কী? তাদের বক্তব্য, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবময় অতীত থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা গ্রিক চিকিৎসকের নামে শপথ নেব? সরকারের এ বক্তব্যও খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। এ কথা ঠিক, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল। তবুও তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিরিখে অনুন্নতই। আর দেশীয় গৌরবের প্রসঙ্গটি আবেগমুক্ত মন নিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। চিকিৎসক সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও দেশীয় সীমা নেই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের একটি চমৎকার বক্তব্য আছে, আইডিয়া পশ্চিমের কি উত্তরের সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা জাতির কল্যাণকর কি না। তা ছাড়া আর একটি বিষয় ভাবতে হবে। আজ যখন উন্নত আধুনিক চিকিৎসা এসে গেছে তখন কোনও দেশেই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণের যৌক্তিকতা নেই। দেশীয় গৌরবের নামেও নয়। তাতে চিকিৎসাই মার খাবে।

এন এস সি-র সভায় 'যোগা'-কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, চিকিৎসকদের জন্য দশ দিনের যোগা ট্রেনিং-এর কথা বলা হয়েছে। এআইডিএসও-র মেডিকেল ইউনিটের আহ্বায়ক ডাঃ সামস মুসাফিরের বক্তব্য, আধুনিক চিকিৎসার সাথে প্রাচীন চিকিৎসার মিশ্রণ ঘটিয়ে যে 'ক্রসপ্যাথি' বা 'মিক্সোপ্যাথি' আনা হচ্ছে তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ডাঃ সজল বিশ্বাসের সংযোজন, এর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের জায়গায় চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু যুগ আগের প্রথাগত চিন্তা পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চিকিৎসাকে মানুষের ভাগ্য-নির্ভর করে তোলার চেষ্টা। অর্থাৎ কপাল ভাল হলে রোগী বাঁচবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে সেখানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ মানুষকে দিতে গেলে সরকারকেই তার দায়িত্ব নিতে হয়, তার জন্য উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হয়। পরিকাঠামো তৈরি করতে হয়। যে দায়িত্ব পালন থেকে সরকার ক্রমাগত সরে যাচ্ছে। সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। আর সরকারি চিকিৎসা পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে। বাঁচা-মরাকে মানুষের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্র, তুকতাক ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করে দিয়েছে। সেই পরিকল্পনাকে আরও বাড়াতে এবং বহুমুখী রূপ দিতেই সরকার মেডিকেল পাঠক্রমে মহর্ষি চরক শপথের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চাইছে।

যাঁরা দেশীয় প্রাচীন চিকিৎসকের নামে শপথের কথা বলছেন, তাঁরাই চিকিৎসাকে মুনাফাবাজদের কব্জায় তুলে দিচ্ছেন। এর ফলে শপথটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। চরকের সময় ভারতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কায়েম হয়নি। তখন চিকিৎসাকে মুনাফার পণ্য হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়নি। সেবার মানসিকতা নিয়েই চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেছেন। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার রক্ষক সরকারগুলি আজ শিক্ষা, চিকিৎসাকে পরিষেবা থেকে সরিয়ে মুনাফার পণ্যে পরিণত করেছে। আজ একজন চিকিৎসক তৈরি হতে ছাত্রছাত্রীকে কমবেশি দশ-বারো লাখ টাকা খরচ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসক হওয়ার পর এই টাকা তাঁরা কী ভাবে কত দ্রুত তুলে আনবেন তা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসাবে দেখা দেয়। এর সঙ্গে মুনাফা ব্যবসায়ী বেসরকারি নার্সিং হোমগুলি অতি মুনাফা করার জন্য যে গলাকাটা বিল করে, বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ করাতে বাধ্য করে, তাতে একটা বিরাট অংশের মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ সবই মেডিকেল এথিক্স বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নৈতিকতার বিরোধী। শপথ কার নামে হবে, এই চিন্তায় যাঁরা এত উদ্বিগ্ন তাঁদের এ নিয়ে কোনও ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। শপথ যাঁর নামেই নেওয়া হোক চিকিৎসায় নৈতিকতা রক্ষা করতে হলে পুঁজিবাদী পরিচালনা থেকে চিকিৎসাকে মুক্ত করতে হবে। অবিলম্বে সরকার সেই ব্যবস্থা নিক।

মৃত্যুর ফেরিওয়ালা

একের পাতার পর

বেকারত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, কেউ বা দেনায় ডুবে কিংবা দেউলিয়া হয়ে এমন মর্মান্তিক ভাবে জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হওয়ার পরেও, পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশের তকমাধারী ভারতে কারা সেই মানুষ, জীবনের ভার বইতে না পেরে এ ভাবে যাদের হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে? রিপোর্ট বলছে, সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আত্মঘাতী হয়েছেন 'দিন আনি দিন খাই' মানুষই। লকডাউনের বছরটিতে বিরাট সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীও আত্মহত্যা করেছেন। বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এর দায় কোভিড পরিস্থিতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই করুন, তা যে সত্য নয়, একটু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে। এনসিআরবি-র তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, মোদি সরকার যখন প্রথমবার সরকারে বসে, সেই ২০১৪ সালে দেশে মোট আত্মঘাতীর ১২ শতাংশ ছিলেন দিনমজুর। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আমলে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-এ এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পাশাপাশি, কোভিড আসার আগেই ২০১৯ সালে বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছিলেন ২ হাজার ৮৫১ জন। ২০২০-তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৪৮ জনে।

অর্থাৎ শুধু অতিমারির সময়টুকুতেই নয়, দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের দুই পর্বের শাসনকাল জুড়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে আছে দেশের বাতাস। অথচ এই সময়েই দেশে বিলিয়ন ডলারের অধিকারী একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির মালিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২-এ। এঁরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে ৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। বাস্তবে মোদিজির ব্যাপক ঢাক-ঢোল পেটানো 'আচ্ছে দিন' এসেছে শুধু আদানি, আম্বানিদের মতো এইসব একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির মালিকদের জন্যই। কোভিড অতিমারি আর লকডাউনের কারণে একচেটিয়া কারবারিদের লোকসান মেটানোর নাম করে বিপুল টাকা উৎসাহ ভাতা হিসাবে তাদের পায়ে ঢেলে দিয়েছে মোদি সরকার। মকুব করে দিয়েছে বিরাট অঙ্কের ব্যাঙ্কঋণ। রেহাই দিয়েছে করের বোঝা থেকে। শ্রম আইন দু-পায়ে দলে আরও বেশি করে শ্রমিকদের ঘাম-রক্ত নিংড়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে পুঁজিমালিকদের। অথচ এই মোদি সরকারই অতিমারির কারণে কাজ খোয়ানো, অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ বেতনে খেটে চলা দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশনটুকুও দিয়ে যেতে রাজি হয়নি। আচমকা লকডাউনে কাজ চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কী খেয়ে বাঁচবে, সন্তান-পরিজন নিয়ে কোথায় মাথা গুঁজবে, সে কথা ভাবার দায়িত্ব তো ছিল মোদি সরকারেরই! সে দায়িত্বের ছিটেফোঁটাও কি পালন করেছেন মোদিজি? বরং হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে ঘরের পথে পাড়ি দেওয়া মানুষগুলির কতজন রাস্তায় চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়ে, অবর্ণনীয় কষ্টে কিংবা দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, সেই সংখ্যাটুকুর হিসাব রাখাও দরকার মনে করেনি তাঁর সরকার। অতিমারির কারণে যখন অসংখ্য কল-কারখানা, ছোট ব্যবসা বন্ধ, কর্মহীন মানুষের সংখ্যা যখন আকাশ ছুঁয়েছে, ঠিক তখনই সংসদে প্রধানমন্ত্রী নিজের মুখে জানিয়ে দিয়েছেন, চাকরি দেওয়া সরকারের দায়িত্ব নয়। বছর খানেক আগে এই প্রধানমন্ত্রীই চরম নির্লজ্জতার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সরকারের প্রধান কাজ শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়ানো, সরকারি কর্তাদের অবহেলা ও ষড়যন্ত্রে রুগ্ন হয়ে পড়া সরকারি সংস্থাগুলিকে সাহায্য করা নয়। খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন ধনপতির স্বার্থ দেখাই যে মোদি সরকারের একমাত্র লক্ষ্য— এর পরেও কি তা আর গোপন থাকে?

অথচ ভোটে জিতে সরকারে বসার আগে এই নরেন্দ্র মোদিই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন না, বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন? বলেছিলেন না, অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবেন? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন না যে, দুর্নীতি, কালো টাকা দূর করে সুশাসন কায়েম করবেন দেশে? অথচ নতুন চাকরি তো দূরের কথা, গত এক বছরে ২.৫ কোটি মানুষের চাকরি গেছে। কাদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলার স্বার্থে সে সব প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিলেন মোদিজিরা, এ প্রশ্নের জবাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করছেন রাজীব তোমরের পরিজনরা। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা মোদি সরকারের নির্মম উদাসীনতা ও চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বলি হলেন, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁরাও তো অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন এই প্রধানমন্ত্রীর দিকেই। দুর্দশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই দেশে ধুঁকে ধুঁকে কোনও ক্রমে জীবন কাটাচ্ছেন যে কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষ, বিজেপি সরকারের কাছে তাঁদেরও প্রশ্ন—'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন ফেরি করে ক্ষমতায় বসে মৃত্যুর ফেরিওয়ালা সাজলেন কেন তাঁরা? শিক্ষা নিয়ে কাদের ব্যবসা বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে আজ দেশ জুড়ে দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার আঙিনা থেকে দূর হয়ে যেতে হচ্ছে? বিপুল পুঁজির একচেটিয়া মালিকদের জন্য যে মোদি সরকার সর্বদা দরাজ-হস্ত, সেই সরকারই কেন লকডাউনে কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-দিনমজুর, সংসারের বোঝা টানতে টানতে কুঁজো হয়ে যাওয়া অসংখ্য মানুষকে আজ রেশনের চাল-গমটুকু থেকেও বঞ্চিত করছে? এই যদি হয়, তাহলে পাঁচ বছর অন্তর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনের এই নাটকের প্রয়োজন কী মানুষের? যে সংসদীয় ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নামে মানুষকে নিজেকেই নিজের অত্যাচারী শোষককে বেছে নিতে হয়, মানুষ কেন মুখ বুজে মেনে নেবে সেই অন্যায় ব্যবস্থা?

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোদি সাহেবকে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী কোনও মানুষ যদি কারও নাম মৃত্যুকালীন নথিতে লিখে যান, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্ররোচনাদায়ীর বিচার হয় আদালতে। মোদিজি মনে রাখলে ভালো করবেন যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে নির্লজ্জ ভাবে নিজেদের যতই বিকিয়ে দিন, রেহাই মিলবে না। আইনের আদালতে না হোক, দেশের যারা আসল মালিক, সেই জনতার আদালতে একদিন এই সব অভিযোগের জবাব দিতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে তাঁদের।

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

১৩ ফেব্রুয়ারি এআইডিওয়াইও বরানগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর শিবির উদ্বোধন করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস। জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড আনন্দ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় ও জেলা নেত্রী কমরেড রমা মুখার্জী উপস্থিত হয়েছিলেন। এতে এলাকার বহু যুবক যুবতী উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে ২৮ জন রক্তদান করেন। আয়োজকেরা প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে নেতাজির ছবি ও উক্তি সম্বলিত মেমেন্টো তুলে দেন।

সরশুনা, কলকাতা

বরানগর, কলকাতা

পাড়ায় নয় ক্লাসরুমেই শিক্ষার দাবি কল্যাণীতে

পাড়ায় নয় ক্লাসরুমে পঠন পাঠনের দাবিতে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির কল্যাণী শাখা কমিটির উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কল্যাণী থানার অন্তর্গত গোকুলপুর পঞ্চপ্রদীপ মোড়ে এক পথসভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শঙ্কর কর্মকার, নিখিল কবিরাজ, শিখা ব্যানার্জী। অভিভাবক হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্যামল দত্ত। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে পৌষালী দত্ত ও ভবানী বিশ্বাস।

হিজাব বিতর্ক

একের পাতার পর

চলেছে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা হল, রাষ্ট্র হবে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের বিষয় হিসাবে থাকবে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই মর্মার্থ লঙ্ঘন করে প্রত্যেকটি সরকার স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস, এমনকী বিধানসভায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার, রীতি পালন করে আসছে। এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভোটের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলির ধর্ম ও জাতপাতের বিভেদ উস্কে দেওয়ার চক্রান্ত। এইভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসক শ্রেণি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব সহ এই কোভিড পরিস্থিতিতে যে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট, যার বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে, সেই আন্দোলন ধ্বংস করতে শাসক শ্রেণি এই বিতর্ককে অত্যন্ত চতুর্যের সাথে কাজে লাগাচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন এবং আগামী বছরে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে মেরুকরণের লক্ষ্যে এই অশুভ জিনিস ঘটে চলেছে। সংখ্যালঘু মুসলিমরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

তিনি বলেন, কর্ণাটক রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুনাম রয়েছে। এই সম্প্রীতি গড়ে ওঠার পিছনে কুভেম্পু, তেজস্বী, কোদাগিনা, গৌরাম্মা, পণ্ডিত তারানাথ সহ বিদ্বজ্জনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শাসক শ্রেণি হীন উদ্দেশ্যে এর উপর আঘাত হানছে।

তিনি বলেন, প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী এই বিভেদের খেলা থেকে দূরে রয়েছেন। এটা অত্যন্ত আশার কথা। এ জন্য তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঐক্য ভাঙার শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে নামতে হবে। এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি এবং সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে ১২ ফেব্রুয়ারি হিজাব বিতর্কে যুক্ত না হয়ে নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সিঙ্গুর

অক্ষরের মালায় গাঁথা এক লড়াকু সৈনিকের অভিজ্ঞতা

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে গণআন্দোলনের ইতিহাসে ‘সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে’ কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বামপন্থার ভেকধারী শাসকের অনাচারের বিরুদ্ধে সেদিন কৃষক সহ সাধারণ মানুষ যে ভাবে চোখে চোখ রেখে গর্জে উঠেছিলেন তা গোটা দেশের জনসাধারণের মনে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। সম্প্রতি ‘সিঙ্গুর ঃ এক লড়াইয়ের ইতিহাস’ শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হল। লেখিকা অমিতা বাগ ওই আন্দোলনে অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র ‘প্রকাশকের কথা’য় লিখেছেন, “লেখিকা ...সিঙ্গুরের জমি রক্ষার লড়াইয়ে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেখেছেন, আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে এই আন্দোলনের বিভিন্ন মোড় ও গতিপথ।”

এই আন্দোলন যখন চলছিল আমরা তখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দ্বারে পা রাখছি। এর ঘটনাবলি মনে যে গভীর রেখাপাত করছিল তা বলাই বাহুল্য। আজ দীর্ঘ ১৬ বছর পর যখন এই বই পাঠ করছি, প্রতিটি পাতার অক্ষরগুলো কেমন যেন জীবন্ত ছবি হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

সিঙ্গুর আন্দোলন আমাদের রাজ্যে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। শিল্প না কৃষি, বেকারদের কর্মসংস্থান কী ভাবে হবে, শিল্পের জন্যে বৃহৎ পুঁজির মালিকের ইচ্ছাই কি প্রাধান্য পাবে— ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জনমানসে দেখা দিয়েছিল। লেখিকা এই বইতে চেষ্টা করেছেন সেই সব প্রশ্ন এবং আন্দোলনই কী ভাবে তার উত্তর যুগিয়েছিল তা তুলে ধরতে। পুলিশ যখন কৃষক রমণীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার মদমত্ততায় বলেছিলেন, ‘টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।’ সেদিন সিপিএম গোটা রাজ্য জুড়ে প্রচার করেছিল যে, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো

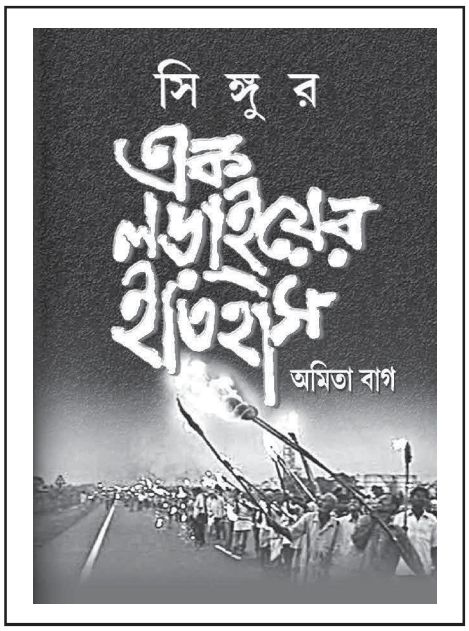

গাড়ির কারখানা স্থাপন হলেই লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা ক্ষুরধার যুক্তি শাসকের অসার প্রচারের ফানুসটা ফাঁসিয়ে দিয়েছিল অচিরেই। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসকের কোনও কৌশলই কার্যকর হয়নি। একচেটিয়া পুঁজিমালিকের সেবায় মরিয়া শাসকের অত্যাচার মোকাবিলা করতে গণআন্দোলনের অগ্নিশিখায় তপ্ত সাধারণ মানুষ কী সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, লেখিকা খুব সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন।

আরেকটি বিতর্কও সিঙ্গুর আন্দোলনকে ঘিরে চলে, এই আন্দোলনের সূচনা কে করেছিল? এই বিতর্কটা আরও বেশি প্রকট হয় যখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুলের পাঠ্য বইয়ে ‘সিঙ্গুর আন্দোলন’কে অন্তর্ভুক্ত করে তার যাবতীয় কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পণ করে। সরকারি বইয়ে লেখা হয়, ‘১৮ জুলাই ২০০৬ ধানের চারা পুঁতে সিঙ্গুরে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’! এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন লেখিকা। তিনি লিখছেন, “...প্রকৃত সত্য হল, বাজেমেলিয়ার নিউ উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের সামনে টাটার পরিদর্শক টিমের গাড়ি ঘিরে ২৫ মে, ২০০৬ প্রথম বিক্ষোভ হয়েছিল। এই বিক্ষোভে কোনও দল বা সংগঠন নেতৃত্ব দেয়নি। সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষ কৃষক-খেতমজুর-ভাগচাষি এবং তাদের পরিবারের মা-বোনেরা সেদিন বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। এর আগে ২০-২১ মে, ২০০৬ হাতে লেখা পোস্টারে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছিল, ‘উর্বর কৃষিজমিতে টাটার কারখানা হতে দিচ্ছি না’, যা গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে এস ইউ সি আই (সি) দলের স্থানীয় কর্মীরা লাগিয়েছিলেন।” আন্দোলনের দুই পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের ভূমিকা এবং আন্দোলনের গতিধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে নানা সময়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের ভূমিকা কী ছিল, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

কোনও উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সম্পর্কে রচিত বইয়ে লেখক বা লেখিকার নিজস্ব মতামত, বিশ্বাস ও উপলব্ধি প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সেই বইয়ে দেওয়া তথ্য, বক্তব্য, মন্তব্য সত্যনিষ্ঠ এবং ইতিহাসসম্মত কি না! সেই বিচারে বইটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বইয়ের ভিতর প্রতিটি ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে নিজস্ব মন্তব্য ছাড়াও, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মন্তব্য, তৎকালীন সরকারের মন্ত্রীদের মন্তব্য, তৎকালীন শাসকদলের অবস্থান এবং আন্দোলন সম্পর্কে তাদের প্রকাশনা, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর, ২০১১-র পর পরিবর্তিত সরকারের সিঙ্গুর সম্পর্কে অবস্থান, জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের মামলা এবং তার রায় ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখিকা তাঁর বইয়ে যুক্ত করেছেন। আন্দোলন সম্পর্কিত নানা রঙিন ছবিও বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

সভ্যতার যাবতীয় ইতিহাসটাই হল সংগ্রামের ইতিহাস। সিঙ্গুরের জমি রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ যেভাবে অত্যাচারী শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন, জীবন কুরবানি দিয়েছেন তা সকল সংগ্রামী মানুষের কাছে প্রেরণার। বিশেষ করে শহিদ রাজকুমার ভুল এবং শহিদ তাপসী মালিকের আত্মবলিদান এই আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল দুটি নাম। এই বই সেই সকল শহিদের নাম শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করেছে। লেখিকা নিজে কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় কৃষকদের জানকবুল এই লড়াইতে নিজেকে সামিল করে আন্দোলনকারীদের অবদান ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াই লড়েছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাকে যখন তিনি অক্ষরের মালায় গেঁথেছেন, তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে পাঠকের মনকে যে নাড়া দেবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আশা করি, এই বই মানুষের কাছে পৌঁছে জীবনের লড়াইয়ের পাথেয় হিসাবে তাঁদের মনোবল জোগাবে।

শাসক কোনওদিনই শেষ কথা বলেনি, বলেছে জনগণ। বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে তৎকালীন শাসকদল সিপিএম যে অন্যায় করেছিল তার জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়া তো দূর, উল্টে সেই একই উদ্ধত মেজাজ এবং চূড়ান্ত অহমিকা নিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে অযৌক্তিক বক্তব্য রেখে চলে আজও। ভাবখানা এমন যে সেদিনের আন্দোলন সম্পূর্ণ ভুল এবং টাটার সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়াটাই এ রাজ্যে শিল্পের দুরবস্থার জন্যে দায়ী! এর স্পষ্ট জবাব দিয়েছে এই বই।

আজ যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নানা অনাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, শাসকের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছেন, সর্বোপরি এই শোষণমূলক সমাজ ভাঙার লড়াইতে যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের কাছে এই বই প্রেরণার উৎস হবে, এই আশা থাকছেই।

সৌপ্তিক পাল, পাইকপাড়া

জীবনাবসান

নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রথম জীবনে কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের চৌহাটিতে বসবাস করতেন এবং সিপিএম দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের চরম সন্ত্রাসের ফলে তিনি ওই এলাকা ছেড়ে নানা স্থান ঘুরে নদীয়ার নাকাশিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন এবং এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সংস্পর্শে আসেন। পরে স্ত্রীর চাকরির সূত্রে তিনি বেশ কয়েক বছর তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে ছিলেন এবং একটি প্রেসে কাজ করতেন। সেখানে এসইউসিআই(সি)-র নেতা কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস সহ ওই জেলার তৎকালীন নেতৃত্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। দলের কাজ করার সূত্রে তিনি ঐ জেলার খাসপুর গ্রামে কয়েকজনকে দলে যুক্তও করেন।

পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে নাকাশিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। জেলার অন্যতম নেতা কমরেড মিলন মজুমদারের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে তিনি নিষ্ঠার সাথে দলের কাজ শুরু করেন। এখানেও একটি ছাপাখানায় কাজ নিয়ে প্রেসকর্মীদের সংগঠিত করে তিনি একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দলের কাজকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং সেই সূত্রে নাকাশিপাড়া সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠা ছিল খুবই গভীর। তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারালো। ১৯ ফেব্রুয়ারি বেথুয়াডহরিতে তাঁর স্মরণসভা।

কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ লাল সেলাম

বীরভূম জেলার রামপুরহাট লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জার্জিস আলি ১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কুতুবপুর গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৮০-র দশকের শেষভাগে প্রয়াত কমরেড আতাহার রহমানের মাধ্যমে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত দলের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বুকে বহন করে উন্নত জীবনবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পরিবারে তীব্র আর্থিক সংকট দলের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে কখনওই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। লোকাল অফিসে দায়িত্ব সামলেছেন, একটা সময়ে জেলা অফিসের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ঘাটশিলা স্টাডি সেন্টারেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

মিতভাষী, অত্যন্ত সংবেদনশীল চরিত্রের কমরেড ছিলেন। ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে তিন-চার বছর খুবই অসুস্থ ছিলেন। তার মধ্যেও দলের খোঁজখবর রাখতেন। কমরেডরা গেলে বা ফোন করলে খুবই আনন্দিত হতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ, দায়িত্বশীল কমরেডকে হারাল।

কমরেড জার্জিস আলি লাল সেলাম

‘দুয়ারে মদ’ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি আয় বাড়ানোর নামে মদের ই-রিটেল পোর্টালের মাধ্যমে ক্রেতাদের বাড়িতে মদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এআইডিওয়াইও ৮ ফেব্রুয়ারি আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁরা আবগারি দপ্তর ডেপুটেশনে গেলে কোনও সদুত্তর না পেয়ে কর্মীরা পথ অবরোধ করেন। পুলিশ এআইডিওয়াইও রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল সহ ৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে।

বর্ধমান স্টেশন চত্বর, পূর্ব বর্ধমান

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ফরেন লিকারের উপর থেকে প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ট্যাক্স কমিয়েছে। এরপরও রাজ্য সরকার মদ ব্যবসাকে লাভজনক করতে কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই ও বাঙ্গালোরের চারটি সংস্থার সাথে চুক্তি করেছে। ‘দুয়ারে মদ’ পৌঁছানোর প্রসঙ্গে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘রাজ্যে যখন তীব্র বেকার সমস্যা তখন রাজ্য সরকারের এমন ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিন্দনীয়। আসলে পরিবর্তনের কথা বলে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। সুস্থ ও সুন্দর নাগরিক জীবন দিতে ব্যর্থ এই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।’ এদিন সন্ধ্যার পর বিক্ষোভকারীরা শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পেলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। এদিনের ঘটনার প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও ৯-১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। বিক্ষোভে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। কলকাতায় বেঙ্গলচেম্বার অফ কমার্স-এর সামনে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল এবং সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি।

হরিশচন্দ্রপুর, মালদা

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের আত্মবলিদান

তিনের পাতার পর

কার জামাকাপড় নেই, কার জুতো ছিঁড়ে গেছে, কার ওষুধপত্র দরকার ইত্যাদি সমস্ত কিছুর খবর তিনি রাখতেন। তাঁর অপর এক বিপ্লবী সাথী যশপাল লিখেছেন, ‘‘আজাদের নিয়ম ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যান্য সাথীরা খেয়ে নিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খেতেন না। ...আজাদ সবথেকে শেষে খেতেন, আর যখন খাবারের অভাব থাকতো তখন বলে দিতেন খিদে নেই।’’

বিপ্লবের প্রয়োজনে হত্যা করা কখনও জরুরি হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত বা দলের টাকা জোটানোর প্রয়োজনে হত্যা করাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, ‘‘আমাদের দল আদর্শবাদী বিপ্লবী দল। দেশভক্তদের দল, হত্যাকারীদের দল নয়। টাকা-পয়সা না থাকতে পারে, আমরা না খেয়ে গ্রেপ্তার হয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়তে পারি, কিন্তু এমন ঘৃণিত কাজ আমরা করতে পারি না।’’ এমনই ছিল রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আজাদের অবিচল আস্থা ও নিষ্ঠা। অথচ এই ধরনের মহান বিপ্লবী চরিত্রগুলিকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যা দিয়ে অপমানিত করা কতটা বেদনাদায়ক ও লজ্জার ব্যাপার। প্রতিটি যুগে সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা এমন মহৎ বিপ্লবীদের তৈরি করে, যারা মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করে, দৃঢ়তার সঙ্গে ফাঁসির দড়িকে গলায় পড়ে শহিদ হয়। অথচ স্বাধীন ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা এই মহান বীরদের ‘সন্ত্রাসবাদী’ হিসেবে তুলে ধরে যাতে এঁদের সংগ্রামের উত্তরাধিকার কেউ বহন না করে এই উদ্দেশ্যে।

বর্তমানে পুঁজিবাদের চরম ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে সামাজিক দায়বদ্ধতা যখন দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধহীন মানসিকতা ক্রমশ বাড়ছে সেই সময়ে চন্দ্রশেখর আজাদের মতো মহান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার সত্যিকারের উদ্দেশ্য হল তাঁর জীবন সংগ্রাম ও আত্মবলিদান থেকে শিক্ষা নিয়ে, তাঁর স্বপ্ন ‘মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের’ লক্ষ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ উত্তরাধিকার।

নজর কর্পোরেটের স্বাস্থ্যে

একের পাতার পর

পরিকল্পনার খরচকেও ধরা হয়েছে। অথচ এর বেশিরভাগটাই অন্য ক্ষেত্রের বিষয়!

এবারের বাজেটে মেডিকেল ও পাবলিক হেলথ খাতে বরাদ্দ ভীষণ ভাবে কমানো হয়েছে। গত বছর এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৪ হাজার ৮২০ কোটি টাকা। এ বছর তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪১ হাজার ০১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মূল বুনিয়াদি জায়গায় বরাদ্দ ৪৫ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্ধেকের কাছাকাছি করা হয়েছে (৪৫.১৯ শতাংশ কমানো হল)। এর ফলে হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়ার এখনও যতটুকু সুযোগ আছে তা বন্ধ হবে। মার খাবে কিউরেটিভ অর্থাৎ হাসপাতাল বেড, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রিভেন্টিভ অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য তৈরির কর্মসূচি।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় ভাবে গৃহীত যেসব প্রোগ্রাম বিভিন্ন রাজ্যে পরিচালিত হয়, সেখানেও বাজেট ভীষণভাবে কমানো হয়েছে। এই খাতে গত বছর বরাদ্দ ছিল ৫০ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা, এ বছর কমিয়ে তা করা হল ৪৭ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই খাতেও কমানো হলো ৫.৯ শতাংশ। এই অর্থ দিয়ে মূলত মাতৃস্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে টিবি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ সমস্ত প্রতিরোধযোগ্য রোগের বিরুদ্ধে প্রোগ্রামগুলি পরিচালিত হয়। করোনা অতিমারির মধ্যে করোনা বহির্ভূত সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জনস্বাস্থ্য প্রোগ্রামগুলি ভীষণভাবে মার খেয়েছে। ফলে যক্ষ্মা এবং ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি যাতে মৃত্যুহার প্রায় একশো শতাংশের কাছাকাছি তা বেড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ছে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা। সামগ্রিকভাবে মৃত্যুর হারও বাড়ছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালের বেশিরভাগ বেড করোনা বেডে পরিণত করার ফলে অ-করোনা রোগীর মৃত্যুর হার দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের প্রত্যাশা ছিল করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হবে। অথচ বিজেপি সরকার করলো ঠিক তার উল্টো।

গত বছর স্বাস্থ্য বাজেটে অতিরিক্ত ৩৯ হাজার ০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল কোভিড টিকাকরণের জন্য। এ বছর কমিয়ে তা করা হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার কোটি টাকা। বাকি ৩৪ হাজার কোটি টাকা কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনও বিষয়ে এমনকি করোনা সংক্রান্ত কোনও বিষয়েও বরাদ্দ করা হল না, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমানো হল ৩৪০০০ কোটি টাকা যা মূল বাজেটের ৪০ শতাংশ, যখন করোনা বিধ্বস্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেবল প্রলেপ লাগাতে এর বহুগুণ টাকা প্রয়োজন ছিল!

এবছর সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং প্রধানমন্ত্রীর হলিস্টিক পুষ্টি প্রকল্প বা পোষণ (POSHAN) বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ হাজার ২৬৩ কোটি। দেশ জোড়া অপুষ্টি যেখানে বাড়ছে, এইখাতেও সেখানে বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৩.১ শতাংশ। আয়ুষ্মান ভারত আরোগ্য যোজনা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ হাজার ২৩৪ কোটি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ১৫১৬৩.২২ কোটি। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা বাবদ ১০ হাজার কোটি। ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশন বাবদ ২০০ কোটি টাকা। এ ছাড়াও জোর দেওয়া হয়েছে টেলিমেন্টাল হেলথ সার্ভিসের উপর।

মোদি সরকার ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশনের মাধ্যমে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই ডিজিটালাইজড করার চেষ্টা করছে। চালু হচ্ছে প্রতিটি রোগীর জন্য ইউনিক আই ডি। প্রত্যেক পরিষেবা দাতা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন তৈরি করা হবে। অর্থাৎ এই বাজেটে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ডিজিটালাইজড করার জন্য এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই বেশিরভাগ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যথার্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা সেখানে ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

এই বাজেটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত ২০১৭ সালের তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির রূপায়ণকে সম্পূর্ণ করতেই বেশি সচেষ্ট। সরকার সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের নামে পুরোপুরি বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী করতে চাইছে। আর এই সার্বিক বিমানির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চাই স্বাস্থ্যের ডিজিটালাইজেশন। তার জন্যেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের উপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত কিংবা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী এসবই হল স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিমানির্ভর ও কর্পোরেটমুখী করে তোলার পদক্ষেপ। বর্তমান স্বাস্থ্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে তৈরি বাজেটে জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলিকে ছাঁটাই করে বিমামুখী ও কর্পোরেটমুখী ব্যয়বরাদ্দ বহুগুণে বাড়ানো হল। ফলে এর মধ্য দিয়ে জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকার ও সুযোগ যতটুকু ছিল তাও বহুগুণে সংকুচিত হবে। জনস্বাস্থ্য নয়, এই বাজেট কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী ও বিমা ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফাকেই সুনিশ্চিত করবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই ডেউচা-পাঁচামি খনির কাজ শুরুর প্রতিবাদে আন্দোলন

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বীরভূমে ডেউচা-পাঁচামি খনির কাজ শুরুর বিরুদ্ধে এবং কয়লা প্রকল্পের ডিপিআর ও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে জনমত গড়তে ওই এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে প্রচার অভিযান চালানো হয়। দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক মদন ঘটকের নেতৃত্বে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৪ জনের একটি দল ডেউচা, মথুরাপাহাড়ি, হাড়মাডাঙা, দেওয়ানগঞ্জ, হরিণসিঙা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে প্রচার চালায়। আদিবাসী সহ বহু মানুষ প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং এলাকায় মিটিং করতে ও কমিটি গঠনে সম্মত হন।

নন্দীগ্রামে আন্দোলন

'দুয়ারে মদ' ও 'পাড়ায় শিক্ষালয়'-এর বিরোধিতা এবং নন্দীগ্রামের সকল মৌজায় নিকাশি, নদীবাঁধ নির্মাণ, নন্দীগ্রামের রেল প্রকল্প সম্পন্ন করার দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান কর্মসূচি পালন করল এস ইউ সি আই (সি) নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। উপস্থিত ছিলেন লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোজ দাস, সদস্য অসিত প্রধান, অসিত জানা, বিমল মাইতি সহ অন্যান্য নেতারা।

প্রথম শ্রেণি থেকে ক্লাস চালুর দাবিতে বিক্ষোভসভা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির

যাদবপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি

বাগনান, হাওড়া। ৭ ফেব্রুয়ারি

দুয়ারে মদ ঃ কালনায় বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে মদ' প্রকল্পের প্রতিবাদ জানিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। একই দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি কালনা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আবগারি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কালনা মহকুমা সম্পাদক শুভেন্দু গোস্বামী এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে নির্মল মাঝি ও অন্যরা।

জনবিরোধী বাজেট ঃ শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ

কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে ৪ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বিক্ষোভ

স্কুল চালু হলেও, 'পাড়ায় শিক্ষালয়ে' ছাত্রদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বও মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী কাজ করেন। বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা সহ সকল কাজই তাঁদের করতে হয়। এর পরেও তাঁরা মাসিক বেতন পান মাত্র ১৫০০ টাকা, তাও বছরে ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাস। বেতন বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের দাবি আজও উপেক্ষিত। এই কঠিন অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিলের প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়েছে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও বরাদ্দ কমছে। ফলে কর্মীদের উপর যেমন রান্নার চাপ বাড়ছে, খাদ্যের গুণমানও কমছে।

সংগঠনের উদ্যোগে মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বরাদ্দ বাড়িয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্পকে উন্নত করা, স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে পঠন-পাঠন চালু, ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা সহ ১৩ দফা দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল হয় ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, দাবি পূরণ না হলে ২২ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ হবে।

নিয়োগের দাবিতে হলদিবাড়ি ব্লক যুব সম্মেলন

মদ নিষিদ্ধ, দুয়ারে মদ কর্মসূচি বাতিল, সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জে এ আই ডি ওয়াই ও-র ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com